চট্টগ্রাম • বুধবার • ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ • ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ • ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ | ৮ পৃষ্ঠা • মূল্য ৭ টাকা | চট্টগ্রাম • রেজি. নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১১৮

রূপান্তর নবযাত্রা ৩০

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

৩ গণপ্রতিরোধ গড়তে হবে অপশক্তির বিরুদ্ধে : সালাম

৫ টানেল সড়কের পাশে চলছে গরু জবাই, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ পথচারী

৬ 'বিদেশি' ফুটবলারে ঠাসা মরক্কো ফুটবল দল!

এবার বুবলীর বিপরীতে রাজ

প্রথমবার সিনেমায় জুটি হয়েছেন শবনম বুবলী ও শরিফুল রাজ। সরকারি অনুদানের 'দেয়ালের দেশ' নামে সিনেমায় তাঁদের দেখা যাবে। এটি পরিচালনা করছেন মিশুক মনি।

বিস্তারিত ▶ পৃষ্ঠা ৯

বুদ্ধিজীবী হত্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এখনো বিদ্যমান

মুহাম্মদ শামসুল হক

যে কোনো দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ নানান ক্ষেত্রে আলোর মশালের ধারক-বাহক ও প্রচারক শক্তি হচ্ছে সে দেশ বা জাতির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে তাদের এ দেশীয় দোসর আলবদর-আল শামস বাহিনীর শীর্ষ নেতাদের সহযোগিতায় শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিজীবী হত্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নানান সংকটময় মুহূর্তে সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত বুদ্ধি-পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা দেওয়ার মতো অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীর অভাব অনুভূত হয়েছে- যার রেশ এখনো চলছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোর দিয়ে কথা বলার মতো মেধাবী ও সাহসী বুদ্ধিজীবীর অনুপস্থিতির কারণে ৭৫ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি ভাবধারার কথিত বুদ্ধিজীবীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন। তারা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন-যার খেসারত জাতিকে এখনো দিতে হচ্ছে।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় অবস্থানরত বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি কিংবা কর্মস্থল থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। এর মধ্যে একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ ৮ জন বুদ্ধিজীবী নিখোঁজ হন ১৪ ডিসেম্বর। ধারণা করা হয় ওইদিনই তাঁদের হত্যা করা হয় এ জন্য ১৪ ডিসেম্বরকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ওইদিন শহীদ হওয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছেন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, ড. আবুল খায়ের, অধ্যাপক রশিদুল হাসান, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ড. এ এন এম ফয়জুল মাহী ও ডা. মুর্তজা। ১০-১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকায় আরও যাঁদের হত্যা করা হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, লেখক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সন্তোষ ভট্টাচার্য, আবুল কালাম আজাদ, সিরাজুল হক খান, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক বিবিসির নিজামুদ্দিন আহমদ, ডা. আবদুল আলীম চৌধুরী, ফজলে রাব্বী, সাংবাদিক সেলিনা পারভীনসহ অনেকে। গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, এএনএম মুনিরুজ্জামান, মুহাম্মদ আবদুল মুকতাদির প্রমুখ ২৫ মার্চ রাতেই শহীদ হন।

বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নে কারা জড়িত-এনিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্রে অনেক তথ্য-উপাত্ত প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সন ডা. এ হাসান লিখেছেন, 'বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পক ছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। জামায়াতে ইসলামীর দপ্তর সম্পাদক মওলানা এবিএম খালেক মজুমদারকে দেওয়া হয়েছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের একটি খসড়া পরিকল্পনা করেন জামায়াতের আব্বাস আলী খান ও গোলাম আযম। এ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল রাও ফরমান আলীর নিকট। সেটা করেছিলেন গোলাম আযম নিজেই। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল বদর বাহিনীর সদস্য আলী আহসান মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী, কামারুজ্জামান, মাঈনুদ্দিন, আশরাফুজ্জামান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান এমরান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি বিভাগের ডা. এহসান, বরিশাল মেডিকেল কলেজের ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা জলিল। ফরমান আলীর পরিকল্পনা ও এদের কাজের সমন্বয় করেছিল পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার বশির ও ক্যাপ্টেন তাহির। ইপিএসএফ, ওয়েস্ট পাকিস্তান রেঞ্জার্স, পুলিশ ও রাজাকারের কিছু সদস্য এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল। অনেক বিহারীও এদের সঙ্গে কাজ করছিল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। শান্তি কমিটির যেসব শীর্ষ নেতা এ কাজে তাদের ছায়া হয়ে কাজ করছিল তারা হলো-সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন, একিউএম সফিকুল ইসলাম, গোলাম আযম, মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, মোহন মিয়া, মওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল মতিন, গোলাম সরওয়ার, এএসএম সোলায়মান, একে রফিকুল হোসেন, নুরুজ্জামান, আতাউল হক খান, তোহা বিন হাবিব, মেজর আফসার উদ্দিন ও হাকিম ইবতেজাউর রহমান।'

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িতদের কয়েকজনের বিচার হয়েছে এবং সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে পাঁচজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, আলবদর নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম,আলবদর বাহিনীর অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন এবং প্রধান নির্বাহী মো. আশরাফুজ্জামান খান। মুজাহিদ ও নিজামীর রায় কার্যকর হলেও অন্যরা এখনো পলাতক। এ ছাড়াও মনে করা হয়, অপরাধীদের অনেককে এখনো চিহ্নিত করা যায়নি।

বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনো তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়নি। বাংলা একাডেমি ১৯৮৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর ২৫০ জনের তালিকা নিয়ে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ' প্রকাশ করে। পরে তারা ৩২৫ জন শহীদ বুদ্ধিজীবীর নাম সংগ্রহ ও তাঁদের নিয়ে 'স্মৃতি ৭১' প্রকাশ করে। (সমকাল ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯)

বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশে শহীদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা এক হাজারের বেশি। ১৯৭২ সালে সরকারিভাবে তৈরি 'বাংলাদেশ' নামে এক প্রামাণ্য চিত্রে শহীদ শিক্ষকের সংখ্যা দেখা যায়, ৯৬৬ জন। এরমধ্যে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক ৬৩৭ জন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ২৭০ জন এবং কলেজ শিক্ষক রয়েছেন ৫৯ জন। ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটিসহ অন্যান্য সূত্রমতে, একাত্তরে ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২জন আইনজীবী, ৯ জন শিল্পী-সাহিত্যিক ও ৫ জন প্রকৌশলীসহ শহীদের সংখ্যা এক হাজার একশ ১১ জন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের বিভিন্ন সময় চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পুলিশ কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে।

অন্যদের মতো তাঁরাও শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বোয়ালখালী উপজেলার স্যার আশুতোষ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শান্তিময় খাস্তগীর, চট্টগ্রাম কলেজের দর্শন বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অবনী মোহন দত্ত, নগরের এনায়েতবাজার এলাকার ডা. মোহাম্মদ শফি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ নূর হোসেন, ত্রিপিটক বিশারদ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু জিনানন্দ, পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক চৌধুরী, বোয়ালখালীর বাসিন্দা ডা. শ্যামল কান্তি লালা, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার এম শামসুল হক, দুর্নীতি দমন বিভাগের উপপরিচালক নাজমুল হক, সেনাবাহিনীর মেজর ডা. আসাদুল হক, ফটিকছড়ির আইনজীবী নূর আহমদ, পটিয়ার ছনহরার আইনজীবী অমলেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এসব ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। কেউ সাধারণ মানুষসহ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন, কেউ আশ্রয় দিয়েছেন আর কেউ উদ্বুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাদানকারী অভিজ্ঞ, নির্লোভ এসব দেশপ্রেমিক পেশাজীবী ব্যক্তিদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে কেউ স্মরণ করে না। দুয়েকজন ছাড়া শহীদ বুদ্ধিজীবীর তালিকায়ও তাঁদের ঠাঁই হয়নি।

তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। স্বাধীনতার ৫১ বছর পরও এ ব্যাপারে যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ের জরিপ হয়নি। ফলে শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শহীদ বুদ্ধিজীবীর তালিকায় স্থান পাননি। আজকের প্রজন্মসহ সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন সংগঠন ১৪ ডিসেম্বরকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে জেনে দিবসটি পালন করলেও সারা দেশের হাজারো বুদ্ধিজীবীর আত্মত্যাগ সম্পর্কে তারা অন্ধকারেই থেকে গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিৎ সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই সুষ্ঠু জরিপের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা এবং ইতিহাসে তাঁদের যথাযথ মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার সঙ্গে জড়িতদের যারা এখনো বিচারের আওতায় আসেনি তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় এনে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা। পিআইডি ফিচার

লেখক : সম্পাদক-ইতিহাসের খসড়া,
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী